ছোট্ট মনের অনুভব

নুজহাত তাহলিল নাওমি

দুপুরবেলা নানুর কাছে বসে দীপা একটি গল্পের বই পড়ছিল। তখন বাড়ির কাজের বুয়া এসে নানুকে বলল, আম্মা, দুই পা ভাঙ্গা একটা লোক এসেছে। সাহায্য চায়। নানু বললেন, কিছু চাল দিয়ে দে।

দীপা তখন কৌতূহলবশত বাড়ির বাইরে গিয়ে দেখে, একটা চাকাযুক্ত কাঠের বাক্সে দুই পা-হারা একজন বয়স্ক লোক বসে আছে। তার হাতে একটা কাগজ। দীপাকে চেয়ে থাকতে দেখে লোকটি ম্লান হেসে বলল, কী দেখছ খুকি? তুমি বুঝি এই বাড়ির মেয়ে? দীপা বলল, হ্যাঁ। এটা আমার নানাবাড়ি।

- কোন ক্লাসে পড়?
- ষষ্ঠ শ্রেণীতে।

খানিকক্ষণ নীরব থেকে দীপা হঠাৎ লোকটিকে জিজ্ঞেস করলো, আপনার এমন অবস্থা কীভাবে হলো? লোকটি উদাস কণ্ঠে বলল, দেশকে স্বাধীন করতে যেয়ে।

- তাহলে, আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা?

লোকটি নিচে নিবদ্ধ দৃষ্টিতে মাথা নেড়ে সায় দিলো।

- আপনার হাতে এটা কিসের কাগজ?
- মুক্তিযুদ্ধের সার্টিফিকেট।

দেখি বলে, দীপা লোকটির হাত থেকে সেটা নিয়ে দেখতে লাগলো। এমন সময় পাশের বাড়ির একজন প্রৌঢ় ব্যক্তি লোকটিকে ডেকে বলল, অ্যাই ব্যাটা ল্যাংড়া, সার্টিফিকেট দেখিয়ে এখানে ভিক্ষা করতে এসেছিস? যা ভাগ!

দীপা তখন প্রতিবাদ করে বলল, এই যে, একজন মুক্তিযোদ্ধাকে সম্মান দিয়ে কথা বলুন। মনে রাখবেন, মুক্তিযোদ্ধারা এ দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান। তাদের আত্মত্যাগের বিনিময়েই এ দেশ স্বাধীন হয়েছে।

দীপা লোকটিকে একটু অপেক্ষা করতে বলে তার সার্টিফিকেটটি নিয়ে বাড়ির ভেতরে গেল। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে সার্টিফিকেটের সাথে একশত টাকা দিয়ে বলল, এটা আমার বৃত্তির টাকা। আপনার জন্য সামান্য উপহার। আর আপনার নাম-ঠিকানা সার্টিফিকেট দেখে লিখে রেখেছি। ঢাকায় গিয়ে আমি আপনার কথা সবাইকে জানাব। লোকটি তখন দোয়া করে বলল, খুকি তুমি অনেক বড় হবে।

ঘরে এসে দীপা তার নানুকে বলল, নানু, তুমি যে লোকটিকে চাল, দিয়েছ তিনি একজন মুক্তিযোদ্ধা। মুক্তিযুদ্ধে তিনি দুটি পা হারান।

- তুই বুঝি সব খবর নিয়েছিস?
- হুঁ।

নানু তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, মুক্তিযোদ্ধারা যে কত কষ্টের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ করে এ দেশ স্বাধীন করেছে তা এখন ক'জন বুঝবে।

সপ্তাহকাল পর দীপা ঢাকায় ফিরে এসে চারটি জাতীয় দৈনিকে একটি চিঠি লিখে পাঠালো।

:একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার কথা :

আমার নাম দীপা। আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি। সম্প্রতি আমার নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়ে একজন পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার দেখা পাই। তার নাম জহীর উদ্দিন। পিতা আলতাব উদ্দিন। গ্রাম- ধানকুনিয়া। পোস্ট সেকান্দরনগর। জেলা- কিশোরগঞ্জ। তিনি একটি চাকাযুক্ত বাক্সে চেপে এখন ভিক্ষা করেন। মুক্তিযুদ্ধে দুটো পা হারিয়ে জীবন ধারণের জন্য একজন বীর মুক্তিযোদ্ধার ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন দেশের প্রতিটি মানুষের জন্য কি লজ্জাজনক ব্যাপার নয়? তার জন্য কি আমরা কিছুই করতে পারি না? আমার আহ্বানে কেউ সাড়া দেবেন কি না জানি না। তবু আমি দেশের সকল বিবেকবান মানুষের প্রতি তার সাহায্যার্থে একটু এগিয়ে আসার জন্য আকুল আবেদন জানাচ্ছি। এই যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এ সান্ত্বনাটুকু পেতে পারেন যে, অনেক দেরিতে হলেও এ দেশবাসী মুক্তিযুদ্ধে তার অবদানের মূল্যায়নে এগিয়ে এসেছে।

কয়েক দিন পর চারটি জাতীয় দৈনিকে দীপার চিঠিখানি প্রকাশিত হলো। পরদিন সেই পত্রিকাগুলো এক ছোট্ট সংবাদে জানায়, দীপার চিঠিখানি সারা দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসহ বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। দীপার আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা ব্যক্তিগত এবং সম্মিলিতভাবে সেই পঙ্গু মুক্তিযোদ্ধার সাহায্যার্থে অবিলম্বে এগিয়ে আসবেন বলে পত্রিকা অফিসে টেলিফোন করে জানান।

সংবাদটি পরে দীপার দু'চোখ আনন্দাশ্রুতে ভরে ওঠে।

লেখক পরিচিতি
নুজহাত তাহলিল নাওমি
ভিকারুননিসা নূন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়
শ্রেণী : ষষ্ঠ
রিমা প্রাইম, বি-৭৯, রোড নং-৪, নিকেতন গুলশান, ঢাকা

মানুষ

রোজলীন রব্বানী নীতি

একটি মেয়ের নাম টুনি। মা, বাবা এবং দুই ভাই নিয়ে তাদের পরিবার। টুনি ভাই বোনদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। টুনির বাবা সরকারি চাকরি করেন আর টুনির মা গৃহিণী। ছোট হলেও টুনি খুব সাহসী এবং বুদ্ধিমতি মেয়ে। টুনিরা ময়মনসিংহ জেলায় বাস করে। তাদের এলাকার নাম নওমহল। টুনিদের পাশের বাড়ির মেয়ে অন্তরা আপুর বিয়ের আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। অন্তরা আপু টুনিকে খুব ভালোবাসেন। টনি তার পড়ালেখার সময় ছাড়া বাকি সময়টুকু অন্তরা আপুর সাথেই কাটায়। একদিন অন্তরার বাবা টুনিদের বাসায় এসে চা খেতে খেতে বললো আমাদের অন্তরার বিয়ে। অন্তরা আপুর বিয়ের কথা শুনে টুনি লাফালাফি শুরু করলো। আনন্দে টুনি অন্তরাদের বাসায় গিয়ে অন্তরা আপুকে জড়িয়ে ধরে বলতে লাগলো। কি মজা, কি মজা, অন্তরা আপুর বিয়ে হবে।

অন্তরার বাবা টুনির বাবাকে অন্তরার বিয়ের দাওয়াত দিতে তাদের বাসায় আসলো। টুনি এখন দিন গুনতে লাগলো কবে অন্তরা আপুর বিয়ে হবে। অবশেষে একদিন অন্তরা আপুর গায়ে হলুদ এসে গেল। গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সবাই বেশ মজা করলো। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষে সবাই যার যার বাড়িতে চলে গেল।

কিন্তু টুনি তখনো বাড়িতে যায়নি। এ সময় অন্তরা, অন্তরা আপুর ছোট বোন অনামিকা ও তার বান্ধবীরা আলাপ-আলোচনা করতে লাগলো বাড়ি-ঘর কিভাবে সাজানো হবে। ওরা ঠিক করলো যে বর এবং কনের স্টেজ সাজানো হবে গোলাপ ও রজনীগন্ধা দিয়ে। এর মধ্যেই টুনি বলে ফেললো আমি আমার বাগান থেকে গোলাপ ফুল বর এবং কনের জন্য সকালবেলা দুটি মালা গেঁথে আনব। অন্তরা আপুর বাবা এসে বললো গেট এবং খাওয়া-দাওয়ার স্টেজ সাজানে হবে ডেকোরেটর দিয়ে। অনামিকা আপু বললো তাদের বাড়ি-ঘর সাজানো হবে গাঁদা ফুল দিয়ে। আর তার বান্ধবীরা বললো জামাইকে ফুল ছিটানোর জন্য গোলাপ, বেলি, কদম বিভিন্ন ধরনের ফুল তারা আনবে। আলাপ-আলোচনার পর তারা যার যার বাড়িতে চলে গেল। সকালে ঘুম থেকে উঠে টুনি তার গোলাপ গাছ থেকে অনেকগুলো গোলাপ উঠালো। তারপর সেগুলো দিয়ে দুটি মালা গাঁথলো। টুনি সকালের নাস্তা করে অন্তরাদের বাড়িতে গেল। টুনি অন্তরা আপুদের বাড়িতে গিয়ে দেখলো অনামিকা আপু আর তার বান্ধবীরা ঘর সাজাচ্ছে। টুনি গিয়ে অনামিকা আপুকে বললো আল্পনা আঁকার কথা। তারপর অনামিকা আপু আর টুনি মিলে আল্পনা আঁকতে শুরু করলো। আল্পনা আঁকা শেষে অনামিকা আপু টুনিকে বললো তুমি গোসল করে তৈরি হয়ে এসো।

তারা সবাই নতুন কাপড় পরে সাজগোজ করে গেইটের সামনে দাঁড়ালো। কিছুক্ষণের মধ্যে বর-এর গাড়ি চলে এলো। টুনি, অনামিকা আপু ও তার বান্ধবীরা ফুল ছিটিয়ে বরকে ভেতরে নিয়ে আসলো। এরপর আস্তে আস্তে আরো মেহমান আসতে লাগলো। তারপর শুরু হলো খাওয়া-দাওয়ার পালা। এমন সময় টুনির বাবা তাদের চাকরকে বললো, শোন আজকে অন্তরার বিয়ে। অনেক লোক খাওয়া খেতে এসেছে। তুমি বিয়ে বাড়ি গেটের সামনে বসে থাকবে। যখন সবাই খাওয়ার পর চলে যাবে তখন তুমি মানুষগুলো গুনবে। তাতে বোঝা যাবে বিয়েতে কতজন লোক এসেছিল। তারপর চাকরটা একটি ইট এনে গেটের সামনে রাখলো।

এরপরে বসে বসে দেখতে লাগলো কি হয়। খাওয়া-দাওয়া শেষে সবাই গেট দিয়ে বেরোতে লাগলো। বেরোবার সময় সবাই একটু করে চোট খেতে লাগলো। আর বিয়ে বাড়ির মানুষদের নামে বদনাম করে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর একজন বুড়ো লোক বেরুলো। তিনি সামান্য একটু পায়ে চোট খেলেন। কিন্তু তিনি বদনাম না করে ইটটা গেটের সামনে থেকে দূরে রেখে দিয়ে চলে গেলেন। চাকরটি তখন দৌড়ে তার মালিকের কাছে গেল। গিয়ে বললো, একজন মানুষ এসেছে। টুনির বাবা বললো, বিয়েতে এতগুলো লোক এসেছে। অথচ তুমি বলছ মাত্র একজন মানুষ এসেছে; বেকুব কোথাকার।

তারপর চাকরটি সমস্ত ঘটনা খুলে বললো তার মালিককে। সমস্ত ঘটনা শোনার পর টুনির বাবা বলল, তুমি ঠিকই বলেছ। বুড়ো লোকটি প্রকৃতপক্ষে সত্যিকারের ভালো মানুষ। এদিক দিয়ে টুনি এসে তাদের কথা শুনছিল। টুনি তার বাবকে বললো, তুমি মাত্র একজনকে মানুষ বললে। অনেক মানুষ তো এসেছিল। তাহলে একজন কেন মানুষ হবে? উত্তরে টুনির বাবা বললো, সবাই মানুষ কিন্তু সৎ এবং আদর্শবান ব্যক্তিরাই প্রকৃত মানুষ। এরপর টুনির বাবা টুনিকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললো। সমস্ত ঘটনা শোনার পর টুনি তার বাবাকে বললো, তুমি ঠিকই বলেছ বাবা। তারপর টুনি অন্য লোকদের বলতে লাগলো, অন্তরা আপুর বিয়েতে সত্যিকারের মানুষ হিসেবে একজন মানুষ এসেছিল।

লেখক পরিচিতি
রোজলীন রব্বানী নীতি
বিদ্যাময়ী সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়,
শ্রেণী : ৫ম
১৩/১, আর. কে. মিশন রোড
নওমহল, ময়মনসিংহ

রায়হানের আকাঙ্ক্ষা

শেখ নাইম বীন হান্নান

রায়হান তার বাব-মার সঙ্গে ঢাকায় থাকে। রায়হানের বয়স ৩ বছর। সেজন্য সে বিদ্যালয়ে যায় না। রায়হানের বয়স কম, তাই সে বাইরে যায় না এবং তার বাবা-মাও তাকে বাইরে যেতে দেয় না। রায়হানের ভাগ্য খারাপ যে, সে বাইরে যেতে পারে না এবং খেলতে পারে না। তার বাবা-মা তাকে বাসার ভেতর থেকে খেলতে বলেছে। তার কারণে রায়হানকে ঘরে থেকে খেলতে হয়। সে অনেকবার ঘরে ফুটবল খেলতে গিয়ে তাদের আলমারির কাচ ভেঙেছে। তার জন্য রায়হানকে তার মা-বাবা মারতে গিয়েও থেমে গেছে। এর কারণ রায়হানকে তারাই ঘরে খেলতে বলেছে। এবং তারা আলমারিতে নতুন কাচ লাগিয়েছে। এমন করে অনেক দিন যায়। তারপর রায়হান যখন ২য় শ্রেণীতে পড়ে তখন একদিন বিকেলে রায়হান তার বাবাকে বলে যে, 'বাবা আমি বাইরে খেলতে যাব।' তখন তার বাবা বলে যে, 'না বাইরে যাবে না, বাইরে বাজে ছেলেরা খেলে এবং তারা বাজে ভাষায় কথা বলে।' রায়হান বলে যে, 'না বাবা, আমি তো তাদের সঙ্গে খেলবো না, আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে খেলবো।' তখন বাবার মুখে 'না' উচ্চারণ শুনে রাহয়ান কাঁদতে কাঁদতে নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা লাগিয়ে দিল। ছেলের কান্না সহ্য করতে না পেরে বাবা বলল, 'যা বাইরে খেলতে যা।' তখন সে খুশি হয়ে দরজা খুলল এবং 'ধন্যবাদ বাবা' বলে দৌড়ে বাইরে চলে গেল খেলতে। এমন করে অনেক দিন সে তার বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে খেলতে লাগলো। একদিন সে বন্ধুদের সঙ্গে মেইন রোডের সামনে একটু চিপা জায়গা আছে যেখানে সে ক্রিকেট খেলছিল। হঠাৎ বলটা মেইন রোডের উপর গিয়ে পড়লো। তাই রায়হান ছুটলো রোডের দিকে। রায়হান ডানে-বামে না তাকিয়েই ছুটছিল। তাই যখন সে বলটা ধরতে গেল তখনই একটি দোতলা বাস এসে তার পায়ের ওপর দিয়ে চাকা উঠিয়ে দেয়। তখন তার বন্ধুরা তার মা-বাবার কাছে গিয়ে এ কথা বলে। তার মা-বাবা তাকে ঢাকা পঙ্গু হাসপাতালে নিয়ে যায়।

হাসপাতলের মধ্যে রায়হানকে তারা-মা-বাবা বলে, বাইরে খেলার সাধ মিটেছে? রায়হান বলে, 'তাহলে, আমাদের জন্য মাঠ করে দাও'। তার বাবা-মা চুপ করে রইলো। এরপর সে ডাক্তার, পাড়া-প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের কাছে একটাই প্রশ্ন করে, 'আমরা কি মাঠ পাব না?' তখন ডাক্তার তাকে বলে যে 'অবশ্যই তুমি মাঠ পাবে।'

৫ মাস পর রায়হানের পা সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল। তার বাবা তাকে টিভি গেমস কিনে দিয়েছে। সে তখন তাই খেলে। তবে রায়হান এখনও মাঝে মাঝে ভাবে, যাদের টিভি গেমস নেই তারা কি মাঠ পাবে না? সে আরো ভাবতে থাকে যে, সে বইপুস্তকে পড়েছে 'স্বাস্থ্যই সকল সুখের মূল এবং ব্যায়াম চর্চা করলে স্বাস্থ্য ভালো থাকে।' কিন্তু শহরে তো মাঠ নেই, খোলা জায়গাও নেই। তাহলে স্বাস্থ্য ভালো থাকবে কি করে? রায়হানের ছোট মনের এ এক বিরাট প্রশ্ন!!

লেখক পরিচিতি
শেখ নাইম বীন হান্নান
আলাতুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়
শ্রেণী : ৫ম
ট-৯৪, মধ্যবাড্ডা , গুলশান, ঢাকা

গন্তব্য

ফারিয়া ইকবাল

তার নাম স্যাম। সে হেঁটে যাচ্ছে নিস্তব্ধ রাতে, একটি রাস্তা ধরে। তার হাঁটার গতি ধীর এবং মন্থর।

রাত তখন ২টা ৩০ মিনিট। স্যাম মনে মনে ভাবছে 'এত রাতে এই নির্জন রাস্তায় বের হওয়াটা কি ঠিক হলো?' ঠিক সেই মুহূর্তেই তার মনের ভেতর থেকে কে যেন বলে উঠল 'হ্যাঁ। তুমি ঠিকই ভাবছ। এত রাতে এই নির্জন রাস্তা দিয়ে বের হওয়াটা তোমার ঠিক হয়নি।' স্যাম চমকে উঠল। 'কে? কে কথা বলছে?'

'আমি।' আবারও সেই কণ্ঠস্বর শোনা গেল। স্যাম বলল, 'আপনার কণ্ঠস্বর আমি কোথায় শুনতে পাচ্ছি?' তখন সেই কণ্ঠস্বরটি বলে উঠল 'আমি তোমার আশপাশেই এক জায়গায় লুকিয়ে আছি।' স্যাম তখন রাগান্বিত গলায় বলল, 'তুমি এক্ষুণি আমার সামনে এসো।' বলতে না বলতেই স্যাম দেখতে পেল সামনের একটি গাছের পেছন থেকে একজন লোক বের হয়ে এলো। তার গায়ে কোর্ট-প্যান্ট এবং তার মুখ মাফলার দিয়ে এমনভাবে ঢাকা যে, নাক পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না। স্যাম তখন লোকটিকে বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি এরকম গাছের পেছনে লুকিয়ে কথা বলছিলে কেন?' লোকটি তখন হেসে বলল, 'কেন তুমি কি ভয় পেয়েছিলে নাকি?' স্যাম তখন ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'না ভয় পাব কেন? আমি এত রাতে এই নির্জন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সাহস পেলে তোমার কণ্ঠস্বর শুনে ভয় পাব কেন?' লোকটি তখন বলল, 'তোমার মন তো বলছে তুমি ভয় পাচ্ছ।' স্যাম বলল, 'তুমি মানুষের মনের কথা শুনতে পাও নাকি? লোকটি তখন বলল, 'হ্যা, আমি মানুষের মনের কথা শুনতে পাই। আমার অনেক ক্ষমতা।' স্যাম বলল, 'মনের কথা শুনতে পাও ভালো কথা। কিন্তু আমি তো আমার ভেতর তোমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছি। 'তুমি মানুষের ভেতরেও ঢুকতে পারো নাকি?' লোকটি বলল, 'হ্যা'। স্যাম তখন বললো, 'কিন্তু তুমি এত রাতে এ রাস্তায় কি করছ?' লোকটি বলল, 'হেঁটে যাচ্ছি।' স্যাম বলল, 'এত রাতে হেঁটে যাচ্ছ এ রাস্তা দিয়ে কেন?' তখন লোকটি বলল, 'তুমি কেন হেঁটে যাচ্ছিলে?' তখন স্যাম বলল, 'কারণ হাঁটা আমার স্বভাব।' তখন লোকটি বলর, 'আমারও তোমার মতই। হাঁটা আমারও স্বভাব। আজও আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম তখন দূর থেকে তোমায় দেখতে পেলাম এবং তখনি পট করে গাছের পেছনে লুকিয়ে গেলাম।' তখন স্যাম বলল, 'চলো আমরা পার্কের ঐ বেঞ্চটাতে বসে গল্প করি।' লোকটি বলল, 'চলো'। তখন দুজনে গিয়ে বেঞ্চে বসলো। স্যাম তখন বলল, 'আমরা কি গল্প করতে পারি?' লোকটি বলল, 'চলো আমরা দুজন দুজনের জীবনকাহিনী বলতে শুরু করি।' স্যাম বলল, 'ঠিক বলেছো।' লোকটি বলল, 'প্রথমে তুমি শুরু কর।' স্যাম নিজের জীবনকাহিনী শুরু করল।

'আমি স্যাম। পেশায় আমি একজন চোর।' লোকটি তখন অবাক হয়ে বলল, 'তুমি চোর?' স্যাম বলল, 'হ্যাঁ। আমি চোর। প্রতি রাতে আমি মানুষের বাসায় গিয়ে টাকা-পয়সা, গহনা চুরি করি। চুরি করে ধরা খাওয়ার ঘটনা আমার জীবনে খুবই কম বা ধরা পড়লেও যে করেই হোক আমি নিজেকে বাঁচিয়ে ফেলি। এটুকু বলে স্যাম হাসতে শুরু করল। লোকটি তখন বলল, 'হাসছ যে?' স্যাম বলল, 'এক রাতের ঘটনা শোনো। আমি এক বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিলাম। বাসায় ঢোকার সময় ধরা পড়ে গেলাম। তখন সমস্ত এলাকাবাসী আমকে মারধর করতে শুরু করল। আমি প্রাণপণ চেষ্টা করলাম নিজেকে বাঁচানোর। কিন্তু পারলাম না। কারো মার পড়ল পিঠে, কারো মার পায়ে আবার কারো মার হাতে। একদম শেষে একজনের লাটির আঘাত পড়লো আমার মাথায়। তখন আমি অজ্ঞান হয়ে যাই। আমার যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম আমি রাস্তার একটি আঁস্তাকুড়ে পড়ে আছি। আমার সারা শরীর তখন ব্যথা করছিল। মাথা থেকে প্রচুর রক্ত ঝরছিল। আমি উঠে চোখে মুখে পানি দেই। এরপর আমি প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি আর চুরি করব না। কিন্তু চোর কি আর এত সহজে চুরি ছাড়তে পারে? তাই আমি তখন রাস্তায় রাস্তায় হাঁটতে শুরু করলাম। সেই থেকে আমি একজন ভবঘুরে।' লোকটি তখন স্যামকে বলল, 'কিন্তু তোমার খাবার জোটে কি করে?' স্যাম তখন বলল, 'খাবার যখন জোটে খাই যখন জোটে না তখন না খেয়েই থাকি।' এরপর স্যাম বলল, 'আমার জীবনকাহিনী তো বললাম। এখন

তোমারটা শুরু করো।' লোকটি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। এরপর শুরু করল।

'আমি জন। পেশায় আমি একজন খুনি।' স্যাম তখন ভীত চোখে জনের দিকে চেয়ে রইল। জন বলল, 'ভয়ের কিছু নেই। আমি তোমাকে খুন করবো না। কারণ আমি খুন করি টাকার বিনিময়ে। লোকজন আমাকে টাকা দেয় কোনো ব্যক্তিকে খুন করার জন্য এবং আমি টাকা নিয়ে সেই ব্যক্তিকে খুন করি। আমাকে তো কেউ টাকা দেয়নি তোমাকে খুন করার জন্য। নয়তো আমি তোমাকেও খুন করতাম।' এবার স্যাম একটা স্বস্তির হাসি দিল। জন বলল, 'এই জীবনে আমি যতগুলো খুন করেছি তা কেউ কখনোই টের পায়নি। কিন্তু ...স্যাম বলল, 'কিন্তু কি?' জন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এই শহরের একজন বিরাট ধনী ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিকে খুন করার জন্য একজন আমাকে ২০ লাখ টাকা দিল। সেই রাতে আমি খুন করতে গেলাম। সমস্ত দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে আমি চলে এলাম। সেই ব্যীক্ত তার বেডরুমে বিছানায় শুয়ে ছিলেন। আমি ঠিক যখন বাইরে থেকে গুলি করতে গেলাম তখনই আমার মাথার পেছনে কে যেন পিস্তল ঠেকাল। আমি পেছন ফিরে দেখলাম একজন পুলিশ মাথার পেছনে গুলি ঠেকিয়ে আছে এবং তখনই ধনী ব্যক্তি দরজা খুলে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, 'জন তুমি যতজনের চোখই ফাঁকি দাও না কেন, আমার চোখ, তুমি কখনই ফাঁকি দিতে পারবে না। চারদিকের সমস্ত খোঁজখবর আমার জানা এবং আমি এটাও জানতাম যে, তুমি আমাকে খুন করতে আসবে এবং আমি পুলিশ রেডি করে রেখেছিলাম।' আমি তখন বিপদ বুঝে হঠাৎ করে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না। পেছন থেকে সমস্ত পুলিশ আমাকে একসঙ্গে গুলি করল।' স্যাম তখন হতবাবক হয়ে জনের দিকে চেয়ে রইল এবং বলল, 'তার মানে তুমি মৃত?' জন বলল, 'হ্যাঁ আমি মৃত।' ধীরে ধীরে চারদিকে ভোরের আলো ফুটতে লাগল। তখন জন বলল, 'ভোর হয়ে যাচ্ছে, আমার পক্ষে এখন আর এখানে থাকা সম্ভব নয়। কারণ আত্মারা কখনো আলোর মধ্যে থাকতে পারে না। আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে যেতে হবে।' স্যাম তখন বলল, 'হ্যা, আমাকেও আমার গন্তব্যে পৌঁছে যেতে হবে। চলো আমরা দুজনে একসঙ্গে যাই।' তারা দুজনে একসঙ্গে যেতে লাগল। সকাল হতে হতে সেই নির্জন রাস্তার লোকজনের ভিড়ও বাড়তে লাগল।

জনের গন্তব্য স্থান খুব কাছে চলে আসল। সে স্যামকে বিদায় জানানোর জন্য পেছনে তাকাল। কিন্তু সে স্যামের দিকে তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখল তা দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। সে স্যামের দিক থেকে চোখ ফিরাতে পারল না। সে দেখল রাস্তার সমস্ত মানুষ স্যামকে ভেদ করে চলে যাচ্ছে। জনের হতবাক দৃষ্টি দেখে স্যাম বলল, 'জন তুমি কি কিছু বুঝতে পারলে?' জন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, 'বুঝতে পেরেছি। আমি সবই বুঝতে পেরেছি।'

এরপর তারা দুজন গলা ফাটিয়ে হাসতে হাসতে তাদের দুজনের একই গন্তব্যের উদ্দেশ্যে হেঁটে চলল।

লেখক পরিচিতি
ফারিয়া ইকবাল
মতিঝিল সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়
শ্রেণী : ষষ্ঠ
১৩২, উত্তর গোরান, ঢাকা

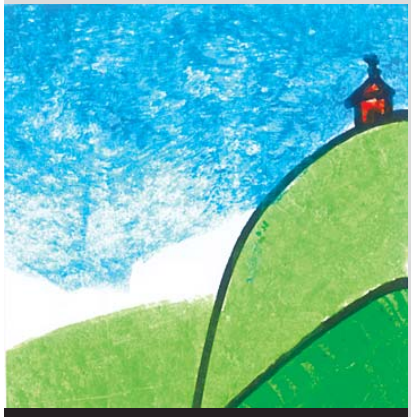

দাদুর গল্প

পঙ্কজ কান্তি দত্ত

গত ফাল্গুনের কথা বাবা-মার সঙ্গে গেলাম সীতাকুন্ড। টার্গেট সর্বোচ্চ শিখর চন্দ্রনাথ মন্দির। বাবা-মা আরও কয়েকবার গেছেন, আমি এই প্রথম। কুমিল্লা থেকে বাসে সীতাকুন্ড। বাস থেকেই পাহাড়ের চূড়ায় মন্দিরটি দেখা যায়। কখন সেখানে পৌঁছব সে এক দারুণ উৎকণ্ঠা। বাস থেকে নেমেই রিকশা শঙ্কর মঠ। সেখানে আমার এক দূরসম্পর্কীয় দাদুর সঙ্গে দেখা। দাদু আর দিদিমার সঙ্গে আমার বয়সী এক মামা। উনারাও যাবেন চূড়ায়। কি মজা! কি মজা!!

সরু পাহাড়ি পথ। দু'ধারে শন, কাশসহ নাম না জানা ঝোপ ঝাড়ে রং বেরংয়ের ফুল, মন মাতানো সব দৃশ্য। কখনো সরু সরু সিঁড়ি, কখনো এক পায়ে পথ ভেঙে আমরা উপরের দিকে উঠছি। কখন উঠব? এ যেন এক ব্যাকুলতা। মা-বাবা-দিদিমা অনেক নিচে। আমাদের সঙ্গে তাল রেখে দাদু এগিয়ে আসছেন। সম্মুখে ১০/১২ হাত স্টিল প্লেটের সরু একটা পুল। থমকে দাঁড়ালাম দুজন। মস্ত বড় একটা খাড়ি। যেন পাহাড়টা খাড়াখাড়িভাবে ফেটে গেছে। মাথার ওপর ঝুঁকে আছে পাহাড়টা, যেন এখনই ভেঙে পড়বে। নিচের দিকে চোখ পড়তেই দারুণ ভয় পেয়ে গেলাম। দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলাম। চোখ বুঁজে আছি ভয়ে। ২/১ মিনিটের মধ্যে কে যেন আমাদের জড়িয়ে ধরল। চোখ খুলে দেখি দাদু। নতুন করে যেন প্রাণ পেলাম। দাদু দুজনকে ধরে ওপারে নিয়ে গেলেন। চল্লিশটি সিঁড়ি অতিক্রম করে উঠলাম বদরিকা মন্দিরে। আমরা মন্দিরের ছায়ায় বসলাম। সুশীতল বাতাসে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। দাদু আমাদের দুজনকে কোলে কাছে বসিয়ে বললেন, 'এ পাহাড়ি পথ বড় দুর্গম, বিপদ সংকুল। প্রতি মুহূর্তে বিপদের হাতছানি থাকে। আমি তখন কলেজে পড়ি। এক উৎসবের সময় স্বেচ্ছাসেবক হয়ে আমরা পাঁচ বন্ধু এখানে এসেছিলাম। এখানেই ছিল আমাদের ডিউটি। একে তো উৎসবের সময় যাত্রীর প্রচন্ড ভিড়, সরু পথ, প্রচন্ড গরম, কি যে অবস্থা তা বলে লিখে বোঝানো যাবে না। ধাক্কা-ধাক্কি, হুড়ো-হুড়ি কি বেহাল অবস্থা! ভিড়ের চাপে হঠাৎ ১০/১১ বছরের একটা ছেলে মায়ের হাত ফঁসকে এ খাড়িতে পড়ে যায়। সে কি আর্তচিৎকার। লোকের হুড়োহুড়ি, কোলাহল। সে এক মহাকান্ড। এগিয়ে গেলাম সেখানে। কি হলো? কী ভাবে হলো? শত মুখে শত কথা, সহস্র মন্তব্য। অনেক নিচে শুধু ২/১টা গাছের পাতা ঈষৎ নড়তে দেখলাম মাত্র। সঙ্গে ছিল ওয়াকিটকি। মুহূর্তের মধ্যে উৎসব কমিটি, পুলিশ, ফায়ার ব্রিগেড সবার সঙ্গে যোগাযোগ করে ফেললাম। বাতাসের গতিতে সবাই হাজির। কিন্তু কি করা যায়? কতটুকু নিচে? কি অবস্থা? কারোরই জানা নেই। সবই অনুমান নির্ভর মন্তব্য।

সহসা জনতাকে ঠেলে এগিয়ে এলো এ কাঠুরে। আলুথালু বেশভূষা, ঘর্মাক্ত দেহ। দেখি! দেখি!! কি হয়েছে? কোথায় হয়েছে? 'একটা ছেলে নিচে পড়ে গেছে' সবাই সমস্বরে বলল। ছেলের মায়ের অবস্থা কি? কে রাখে তার খবর? হয়তো অজ্ঞান অবস্থায় কোথায় ও কেউ তার সেবা করছে।

কাঠুরিয়া শুধু বললেন '৬/৭ জন আসেন আমার সঙ্গে।' একটা লাঠি হাতে মত্ত হাতির মত এগিয়ে যাচ্ছেন দ্রুতগতিতে ঝোপ-ঝাড় দলে। পাহাড়ের পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে তর তর করে নেমে যাচ্ছেন দ্রুত। আমরা তাকে অনুসরণ করছি মাত্র। কারোর মুখে কোনো কথা নেই। ১৫-২০ মিনিট উদভ্রান্ত পথ চলার পর আমরা নেমে গেলাম একটা ছড়াতে। ছোট, বড়, ক্ষুদে অসংখ্য পাথরের ধার ঘেঁষে খাড়ু ডুবন্ত জল বেয়ে চলছে ঝরনায়। দ্রুত সে ধারা পথে ৫/৭ মিনিট হেঁটে পৌঁছলাম খাড়ির সোজা ফাটলের ঠিক নিচে। উপরের দিকে তাকালাম। উপরের মানুষগুলোকে দেখা যায় চলন্ত 'জিরো' আকৃতির মত, কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। সম্মুখে চোখ পড়তেই হতবাক সবাই। কাঠুরে হাত তুলে সবাইকে সাবধান করে দিল। চোখে দৃষ্টি, মুখে কোনো কথা নেই। ৩০-৪০ ফুট একটা অজর ছেলেটিকে হালকাভাবে পেঁচিয়ে রেখেছে। স্থির নিশ্চল অজগরটি। সন্তর্পণে, সন্তর্পণে কাঠুরিয়া এগিয়ে গেল আরও কাছে, আরও কাছে। সবাইকে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন কাঠুরিয়া। আমরা তিনজন ধরলাম লেজের দিকে আর ২ জন ধরলাম মাথায়। অতি সহজে অন্যরা ছেলেটাকে উদ্ধার করে নিয়ে এলো। আমাদের ভাগ্য যে, সাপটার মুখে তখনো একটা খরগোশ ছিল। ছেলেটাকে পরীক্ষা করে দেখা গেল তার কোনো আঘাত লাগেনি, শুধু অজ্ঞান হয়েছে। ৩ জন ওপরে ছুটে গেল খবর দিতে। পরে কাঠুরিয়া আমাদের বুঝিয়ে দিলেন ছেলেটা সাপের ওপর পড়েছে তাই আঘাত লাগেনি। অন্যরা ছেলেটাকে শুশ্রূষা করছে। কাঠুরে ৪/৫টা পাতা হাতের তালুতে ঘষে দুই তিন ফোটা রস ছেলেটির মুখে দিল। দুই তিন মিনিটের মধ্যে ছেলেটা চোখ খুলে তাকালো। সবাই আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম। একগাল হেসে কাঠুরে ছেলেটাকে পাঁজর কোলে নিয়ে তর তড় করে উপরের দিকে উঠতে লাগল। তখন আমরা তাকে অনুসরণকারী মাত্র।

এমন সময় দেখা গেল বাবা-মা আর দিদিমা উঠে আসছেন বদরিকা মন্দিরে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার চলা শুরু। টার্গেট চন্দ্রনাথ মন্দির।

লেখক পরিচিতি
পঙ্কজ কান্তি দত্ত
হাজী নোয়াব আলী পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়
শ্রেণী : ষষ্ঠ
বরুড়া, যশোর